ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি কার স্বার্থে

ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি নিয়ে আলোচনায় কংগ্রেসের নেতা-মন্ত্রীদের মুখে তো বটেই, কিছু আমলা, সাংবাদিক ও বিজ্ঞানীদের লেখায় বা সাক্ষাৎকারেও এখন 'জাতীয় স্বার্থ' শব্দটা বেশ ঘন ঘন ব্যবহৃত হচ্ছে। এঁদের কথাবার্তায়, ভাবেভঙ্গিতে এই চুক্তি নিয়ে এমন গদগদভাব-যেন বহু যুগ অপেক্ষার পর ভারতের কোনও স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে। গত ১৭ জুলাই '০৭ ওয়াশিংটনে এই চুক্তির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পর ২১ জুলাই যখন ঘোষণা করা হল যে, ভারত ও আমেরিকার মধ্যে ''অসামরিক পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে'' তৎক্ষণাৎ ভারতবর্ষের মিডিয়া বা সংবাদমাধ্যম এই চুক্তির সমর্থনে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সকলেই একযোগে 'জাতীয় স্বার্থের বিরাট অগ্রগতি ঘটল' বলে এই চুক্তিকে স্বাগত জানায়। অন্যদিকে বিজেপিকে লোকসভার প্রধান বিরোধী দল হিসাবে এই চুক্তির বিরুদ্ধে কিছু বলতেই হয়। অতএব তারা পার্লামেন্টে ভান করল যেন এই চুক্তির কোনও সংবাদ তাদের জানানো হয়নি, এবং বলল, পার্লামেন্টে আলোচনা না করে এই চুক্তি স্বাক্ষর করার দ্বারা কংগ্রেস সরকার জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি করছে, জাতীয় স্বার্থেই এই চুক্তি নিয়ে পার্লামেন্টে ভোটাভুটি হওয়া দরকার। বিজেপি'র মুখেও সেই 'জাতীয় স্বার্থ রক্ষা'র কথা!

কিন্তু কংগ্রেসের নেতারা যখন বললেন, এই চুক্তি নিয়ে আমেরিকার সাথে আলোচনা বিজেপি সরকারই শুরু করেছিল, শুধু তাই নয়, বর্তমান চুক্তি কংগ্রেস সরকার চূড়ান্ত করার সময় আমেরিকার সঙ্গে সমস্ত আলোচনোর খুঁটিনাটি সর্বদা বিজেপি নেতাদের জানিয়ে রেখেছে, তখন শ্রী আদবানি নীরব হয়ে গেলেন।

বিজেপি'র ভিতরে আরও প্রশ্ন উঠল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতের সমঝোতা ও বন্ধুত্বের জন্যই বিজেপি বরাবর চেষ্টা করেছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা বিজেপি'র রাজনীতি নয়, তা হলে বিজেপি এই চুক্তির বিরুদ্ধতা করে কী করে? এই চুক্তির ফলে 'ভারত আর প্রকাশ্যে পরীক্ষামূলক বোমা বিস্ফোরণ ঘটাতে পারবে না'— এই ছুতো তুলে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার নামে বিজেপি সোরগোল তুলতে পারত। কিন্তু সমস্যা সেখানেও। ১৯৯৮ সালে বিজেপি সরকারের সময়ই ভারত দ্বিতীয়বার পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ ঘটাবার পর, কিছু বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে আমেরিকা। তখন বিজেপি সরকারই ঘোষণা করেছিল, ভারত আর কখনও পরীক্ষামূলক বোমা বিস্ফোরণ ঘটাবে না। এই স্বেচ্ছারোপিত নিষেধাজ্ঞা এখনও বহাল আছে। এই অবস্থায় পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটাবার সুযোগ নিয়ে চিৎকার করা বিজেপি'র শোভা পায় না। অতএব, বিজেপি নেতারা চুপ মেরে গিয়েছেন। 'রামসেতু' এখন তাদের কাছে অনেক বড় নির্বাচনী ইস্যু।

ওদিকে সিপিএম-সিপিআই-এর মতো দল— যাদের সমর্থনের উপরই বর্তমান কংগ্রেস সরকারের অস্তিত্ব টিকে আছে, তারাও 'হুঙ্কার' দিয়ে বলল, 'এই পরমাণু চুক্তির দ্বারা জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই চুক্তি দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করবে। অতএব কংগ্রেস সরকারকে এই চুক্তি বাতিল করতে হবে, কংগ্রেস যেন সিপিএমের সমর্থনকে চিরস্থায়ী বলে ধরে না নেয়।' সিপিএমের পক্ষ থেকে এধরনের বিবৃতি দেওয়ার পরপরই প্রধানমন্ত্রী পাল্টা হুমকি দিয়ে বললেন, 'ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি থেকে পিছিয়ে আসার কোনও প্রশ্ন নেই, এই চুক্তি অপরিবর্তনীয়, সিপিএম যদি সমর্থন তুলে নিতে চায়, তবে তুলে নিক'। মনমোহন সিংয়ের এই পাল্টা হুঙ্কারেই সিপিএম নেতারা তাদের 'ব্যাঘ্রগর্জন'কে নিমেষে বিড়ালের মিউ মিউ আওয়াজে পরিণত করে বললেন, 'সরকারের উপর থেকে সমর্থন তুলে নেওয়ার কথা সিপিএম কখনই বলছেনা, আমরা জাতীয় স্বার্থে চুক্তিটির পর্যালোচনা বা রিভিউ চাইছি।' কংগ্রেস একথা মেনে নিল। কংগ্রেস এবং সিপিএম ও তার মিত্র দলগুলিকে নিয়ে পর্যালোচনা কমিটি তৈরি হল। এখন সেই কমিটির নানা পর্যায়ে বৈঠক চলছে। কোথায় কোন্ শব্দ বা বাক্য পাল্টে দিলে সিপিএমের 'জাতীয় স্বার্থ' রক্ষা পায়, তারই হয়তো চেষ্টা চলছে। এই চুক্তি বাতিলের দাবিতে দেশে বিশাল গণআন্দোলন করার যে আওয়াজ সিপিএম দিয়েছিল, তা যে নিতান্তই ফাঁপা, সেকথা তখনই কংগ্রেস

সরকার জানত, এবং বাস্তবেও তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। কাগজে কিছু গরম বিবৃতিই এখন সিপিএমের 'গণ আন্দোলন'। অবশ্য সিপিএম যদি হিসাব কষে বোঝে যে, নির্বাচনে কংগ্রেসের বন্ধু হয়ে লড়লে সিপিএমের লাভের চেয়ে বেশি ক্ষতি হবে, তবে এই সুযোগে তারা কংগ্রেস সরকারের থেকে সমর্থন তুলে 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী' সাজবার চেষ্টা করতেও পারে। অর্থাৎ সবটাই ভোটের অঙ্ক, আদর্শের কথাগুলো লোকঠকানো বুলি মাত্র। যাইহোক, এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

পরমাণু চুক্তিতে কী আছে

জলবিদ্যুৎ, তাপবিদ্যুৎ ছাড়াও আর একপ্রকার বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, যাকে পরমাণু বিদ্যুৎ বলে। এজন্য যে বিশেষ প্রাকৃতিক কাঁচামালের প্রয়োজন হয় তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি হচ্ছে ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম। মাটির নিচে খনি থেকে আকর সংগ্রহ করে তার থেকে নানা প্রক্রিয়ায় এই দুটি পদার্থকে বের করা হয়। এরপর এদের পরমাণু চুল্লিতে (নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টর) ফেলে জ্বালানো হলে বিপুল তাপশক্তি উৎপন্ন করা যায়, যা দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা যায়। এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল, বিশাল ব্যয়সাপেক্ষ ও খুবই ঝুঁকির ব্যাপার। আমাদের দেশে ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম দুটোই খনি থেকে পাওয়া যায়। ভারতে ইউরেনিয়ামের মজুত এখনও পর্যন্ত অনুসন্ধানে যা পাওয়া গেছে, তা তুলনায় কম। ভারত সরকারের বক্তব্য হচ্ছে, ইউরেনিয়ামের খুব প্রয়োজন, এবং সেজন্যই ইউরেনিয়াম আমদানি করতে আমেরিকার সঙ্গে ওই চুক্তি করা হয়েছে। এরপর আমেরিকা থেকে ভারতে ইউরেনিয়াম সরবরাহ করা হবে, পরমাণু শক্তিধর অন্যান্য দেশ যাদের 'নিউক্লিয়ার ক্লাব'-এর সদস্য বলা হয়, তারাও ভারত চাইলে ইউরেনিয়াম ও তার প্রক্রিয়াকরণের জন্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ বা রপ্তানি করতে পারবে।

পরমাণু কর্মসূচির এই অংশটি শুনে অনেকের মনে হতেই পারে যে, অন্যান্য বহু জিনিসের মতো ভারত ইউরেনিয়ামও আমদানি করতে পারে, তারজন্যই একটা চুক্তি হয়েছে আমেরিকার সাথে, এ তো ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপার, এর মধ্যে খারাপ কি আছে? বিষয়টা এত সহজ সরল নয়। কারণ, ইউরেনিয়াম থেকে যেমন বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা যায়, তেমনই পরমাণু বোমা তৈরির উপাদানটিও উৎপন্ন করা যায়। বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করার পর জ্বলে যাওয়া ইউরেনিয়ামের

যে ছাই তৈরি হয় সেই ছাইকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় (রিপ্রসেসিং) ফেললে পাওয়া যায় প্লুটোনিয়াম, সেটাই হচ্ছে পরমাণু বোমার মূল মশলা বা উপাদান যেটা প্রকৃতিতে পাওয়া যায়না। অতএব, যে দেশ ইউরেনিয়াম জ্বালিয়ে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করতে পারে, সে দেশ পরমাণু বোমাও তৈরি করতে পারে, যদি ছাই থেকে প্লুটোনিয়াম বের করার পুনঃপ্রক্রিয়ার বা রি-প্রসেসিং-এর প্রযুক্তি সেদেশের হস্তগত থাকে। এজন্য বিশ্বের পরমাণু অস্ত্রধর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো, আমেরিকার নেতৃত্বে, বিশ্বে ইউরেনিয়াম বা এজাতীয় পরমাণু জ্বালানি সরবরাহ বা ব্যবসার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছে। আসল মতলব হচ্ছে, নিজেদের হাতের পরমাণু অস্ত্রের জোরে অন্যান্য পরমাণু অস্ত্রহীন বা দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে চোখ রাঙিয়ে মাথা নত করানোর বা ব্ল্যাকমেইল করার যে সুবিধা তারা ভোগ করে, অন্যান্য রাষ্ট্রকে পরমাণু অস্ত্রধর না হতে দিয়ে নিজেদের সেই সুবিধা স্থায়ী করে রাখা। এদের উদ্যোগেই তৈরি হয় পরমাণু অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তি (নিউক্লিয়ার নন প্রলিফারেশন ট্রিটি বা এন পি টি)।

এই চুক্তিতে কোনও রাষ্ট্রের স্বাক্ষর করার অর্থ, একথা ঘোষণা করা যে, সেই রাষ্ট্রটি শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পরমাণু শক্তি উৎপাদন করবে, যুদ্ধের বা আগ্রাসনের উদ্দেশ্যে নয়। কিন্তু কোনও রাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে না অস্ত্রের উদ্দেশ্যে পরমাণু শক্তি উৎপাদন করছে, এটা নিশ্চিত করা যাবে কী দিয়ে? এজন্যই তৈরি করা হয় আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা বা আই এ ই এ। এই সংস্থার তরফ থেকেই পর্যবেক্ষণ করে বলে দেওয়া হয় যে, সত্যিই কোন দেশ অসামরিক উদ্দেশ্যে পরমাণু শক্তি উৎপাদন করছে কি না। সেই দেশের অসামরিক পরমাণু শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে দুর্ঘটনা এড়াবার যথেষ্ট রক্ষাকবচ আছে কিনা, তাও দেখে ঐ সংস্থা। এইরকম ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতেই পরমাণু অস্ত্রে বলীয়ান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা হুলিয়া জারি করে দেয় যে, পরমাণু শক্তিধর অথচ এন পি টি তে স্বাক্ষর না-করা কোনও রাষ্ট্রকে অন্য কোনও রাষ্ট্র অসামরিক উদ্দেশ্যেও পরমাণু জ্বালানি ও প্রযুক্তি সরবরাহ করবে না। ১৯৫৪ সালে তৈরি মার্কিন পরমাণু শক্তি আইনে বলা আছে, পরমাণু শক্তিধর কোন দেশকে আমেরিকা জ্বালানি দেবে না। এরপর ১৯৭৮ সালে এন পি টি তৈরি হওয়ার পর আমেরিকা তার আইনের ১২৩নং ধারায় এন পি টি-তে সই দেওয়ার শর্ত যোগ করে দেয়। এই ধারামতেই ভারতের সাথে চুক্তি হয়েছে বলে তাকে ১২৩ চুক্তি বলা হচ্ছে।

ভারত একটি পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র। ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বে কংগ্রেস সরকার প্রথম ''পরীক্ষামূলক'' পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। দ্বিতীয়বার ভারত বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় ১৯৯৮ সালে বিজেপি সরকারের আমলে। ইতিমধ্যেই ভারতের মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট ও কর্ণাটকে একাধিক পরমাণু শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে। বলা বাহুল্য যে, এর সবগুলো আদৌ শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদনের অসামরিক উদ্দেশ্যে কাজ করে না; পরমাণু বোমা বা অস্ত্র তৈরির কাজ কারবার সেখানে হয়। ফলে বোঝাই যায়, শুধু বিদ্যুৎ নয়, পরমাণু বোমা বা অস্ত্র তৈরির প্রযুক্তিও ভারতের আছে। তবুও ভারত এন পি টি-তে স্বাক্ষর করেনি। এর ফলে আমেরিকার আইন অনুযায়ী মার্কিন সরকার ভারতকে পরমাণু জ্বালানি, এমনকী অসামরিক উদ্দেশ্যেও সরবরাহ করতে পারে না। যদিও ওই আইন-টাইন সবই রাজনৈতিক স্বার্থে ও উদ্দেশ্যে এড়িয়ে যাওয়া মার্কিন শাসকদের কাছে কোনও ব্যাপারই নয়। যেমন ইজরায়েলকে আমেরিকা বিনা বাধায় পরমাণু জ্বালানিসহ প্রযুক্তি ইত্যাদি সরবরাহ করেছে যদিও ইজরায়েল কখনও এন পি টি তে স্বাক্ষর দেয়নি।

একইভাবে ভারতকেও পরমাণু জ্বালানি দেওয়ার জন্য জর্জ বুশ সরকার উদ্যোগী হয়। এই মর্মে দু'পক্ষে গোপন কথাবার্তাও শুরু হয়ে যায়। ২০০৫ সালে শুরু হয় ভারত-মার্কিন প্রকাশ্য আলোচনা। জর্জ বুশ সরকার সিদ্ধান্তও নিয়ে নেয় যে, তারা অসামরিক উদ্দেশ্যে পরমাণু জ্বালানি ইউরেনিয়াম সরবরাহ করার জন্য ভারতের সাথে চুক্তি করবে। কিন্তু সেই চুক্তি মার্কিন কংগ্রেসে পাশ করাতে হবে, এটা সেদেশের আইন অনুযায়ী নিয়ম। সেখানে বিরোধী ডেমোক্র্যাট দলের সদস্যদের তরফ থেকে, মার্কিন নির্বাচনের বছরে রিপাবলিকানদের বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা হতে পারে। এই অবস্থায় চুক্তি করতে হলে— হয় ভারতকে এন পি টি'তে সই দিতে হয়, না হয় আমেরিকাকে তার দেশিয় আইন অতিক্রম করার উপায় বের করতে হয়। আমেরিকা এ ব্যাপারে এতটাই উদগ্রীব ছিল যে, চুক্তি করার জন্য নিজের দেশিয় আইনকে অতিক্রম করতে আলাদা একটি আইন কংগ্রেসে পাশ করিয়ে নেয়। রিপাবলিকান সদস্য হেনরি হাইড-এর দ্বারা পেশ করা এই বিশেষ আইনই হচ্ছে হাইড অ্যাক্ট।

এরই ভিত্তিতে রচিত হয়েছে— ''শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পরমাণু শক্তি ব্যবহার সম্পর্কে ভারত ও মার্কিন সরকারের মধ্যে চুক্তি বা সমঝোতা'', যার মেয়াদ ৪০

বছর। এই চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকা ''নিরবচ্ছিন্নভাবে'' ভারতকে পরমাণু জ্বালানি সরবরাহ করবে; এই জ্বালানি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য যেধরনের পরমাণু চুল্লি দরকার, প্রযুক্তি দরকার, তাও ভারতে রপ্তানি করার অনুমতি মার্কিন শিল্পপতিদের বুশ সরকার দেবে। এরপর ওই চুক্তি যখন আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা আই এ ই এ এবং পরমাণু জ্বালানি সরবরাহ করার ক্ষমতাধর ৪৫টি রাষ্ট্রের সংস্থা 'নিউক্লিয়ার সাপ্লায়ার্স গ্রুপে'রও অনুমোদন পেয়ে যাবে, তখন কেবল মার্কিন কোম্পানি নয়, জার্মানি, ফ্রান্স ইত্যাদি সাম্রাজ্যবাদী দেশের শিল্পপতিরাও ভারতকে পরমাণু চুল্লি বেচতে পারবে, এমনকী চাইলে পরমাণু জ্বালানিও সরবরাহ করতে পারবে। এখন, আই এ ই এ এবং এন এস জি'র তরফে এই চুক্তিকে অনুমোদন দেওয়ার বিষয়টা কেবল সময়ের ব্যাপার। আই এ ই এ যাতে এই অনুমোদন দিতে পারে, সেজন্য ভারত আগেই অঙ্গীকার করেছে যে, ভারতের পরমাণু কর্মসূচির মধ্যে অসামরিক ও সামরিক ক্ষেত্রকে ভারতই পৃথকভাবে চিহ্নিত করে দেবে এবং অ-সামরিক ক্ষেত্রটিতে রক্ষাকবচের ব্যবস্থা ঠিকমত করা হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করার অধিকার আই এ ই এ-কে দেবে।

এখন, এই পরমাণু জ্বালানি আমেরিকা কি কি শর্তে দেবে, চুক্তিতে নানা জটিল ভাষায় তা বলা আছে। তবে একথা স্পষ্টভাবেই বলা আছে যে, ''শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের'' শর্ত যদি ভারত লঙঘন করে, তবে মার্কিন সরকার পরমাণু জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করে দেবে শুধু নয়, ঐ পরমাণু জ্বালানি ব্যবহারের সাথে সম্পর্কযুক্ত যাবতীয় উপাদান ও যন্ত্রপাতি আমেরিকা ভারত থেকে ফেরৎ নিয়ে নেবে।

এইসব শর্ত অবশ্যই ভারতের বর্তমান চালু পরমাণু কর্মসূচির মধ্যে যে অংশটি অ-সামরিক ক্ষেত্রের জন্য ভারত চিহ্নিত করে দেবে, এবং আমেরিকার থেকে পাওয়া নতুন পরমাণু জ্বালানি ব্যবহারের জন্য নতুন যে পরমাণু প্রকল্প ভারত তৈরি করবে বা অন্য যেকোন পরমাণু শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে তা ব্যবহার করবে সেই ক্ষেত্রেই শুধু প্রযোজ্য হবে। ভারত যে যে পরমাণু প্রকল্পকে সামরিক উদ্দেশ্যের জন্য নিয়োজিত বলে ঘোষণা করবে সেসব ক্ষেত্রে এই চুক্তির শর্তগুলি প্রযোজ্য হবে না। অবশ্য ভারত যদি আবার বিস্ফোরণ ঘটানোর দ্বারা পরমাণু বোমার পরীক্ষা করে, তবে আমেরিকা এই চুক্তি বাতিল করবে কিনা, সে বিষয় শর্তে অস্পষ্ট রাখা হয়েছে।

ভারত সরকারের যুক্তি

কংগ্রেসের নেতা ও সরকারের মন্ত্রীরা স্বভাবতই এই চুক্তিকে ভারতের 'জাতীয় স্বার্থে' একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করছেন। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, ভারতে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানো দরকার, এই চুক্তি সে কাজে বিরাট সাহায্য করবে। এই যুক্তিধারা অনুসরণ করেই পরমাণু চুক্তির সমর্থকরা পরমাণু বিদ্যুতের পক্ষে বিরাট হৈ চৈ শুরু করে দিয়েছেন। সৎ ও দেশপ্রেমিক মানুষরাও মনে করছেন, যদি এই চুক্তির দ্বারা ভারত পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনে এগিয়ে যায়, তবে ক্ষতি কি? পরমাণু বিদ্যুতের ভাল-মন্দ, বিপদ ও সম্ভাবনা এসব নিয়ে এখানে আমরা আলোচনা করছি না, পুস্তিকায় একটি পৃথক নিবন্ধে তা করা হয়েছে।

আমরা মনে করি, ভারত-মার্কিন এই পরমাণু চুক্তিতে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়টা নিতান্তই গৌণ। এই চুক্তির প্রকৃত রাজনৈতিক-সামরিক লক্ষ্য ও পরিকল্পনাকে ভারতীয় জনগণের দৃষ্টি থেকে আড়াল করার জন্যই সরকার ও অন্যান্যরা পরমাণু বিদ্যুৎকে মুখ্য ও একমাত্র লক্ষ্য বলে প্রচার করছে। বাস্তব ঘটনা হল, ভারতে এখন মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৩ শতাংশ হচ্ছে পরমাণু বিদ্যুৎ। সরকারি হিসাবেই পাওয়া যাচ্ছে, আমেরিকার থেকে পাওয়া পরমাণু জ্বালানি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হলে, ২০২০ সালে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুপাত দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৭ শতাংশ দাঁড়াবে। অন্যদিকে আগেই বলা হয়েছে, থোরিয়াম জ্বালানি ব্যবহার করে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের ত্রিস্তরীয় নিজস্ব পরিকল্পনা নিয়ে ভারত ইতিমধ্যেই বহুদূর এগিয়ে আছে। তাহলে, একথা কি বিশ্বাস্য যে, ১৩ বছরে মাত্র বাড়তি ৪ শতাংশ পরমাণু বিদ্যুৎ পাওয়ার জন্যই ভারত কয়েক বছর ধরে আমেরিকার সাথে গোপন ও প্রকাশ্য আলোচনার শেষে এই চুক্তিতে গেল? আসলে এই চুক্তির মধ্য দিয়ে ভারত-আমেরিকার রাজনৈতিক-সামরিক জোটবদ্ধতাকে আরও পাকাপোক্ত করা হল। ভারতের দিক থেকে এখানে মস্তবড় প্রাপ্তি হচ্ছে— এই চুক্তির দ্বারা, বর্তমান বিশ্বে একমাত্র সাম্রাজ্যবাদী সুপার পাওয়ার বা দস্যুসর্দার মার্কিন শাসকরা ভারতকে একটি পরমাণু শক্তিধর বড় শক্তি (গ্রেট পাওয়ার) রূপে স্বীকৃতি দিল। অর্থাৎ, বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের সাথে এক পংক্তিতে বসবার অধিকার পাওয়ার রাস্তা ভারতের ক্ষেত্রে প্রশস্ত হল।

দ্বিতীয়ত, প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছেন, ভারতের জন্য বিদেশ থেকে

পরমাণু জ্বালানি ও প্রযুক্তি আমদানি করা, বিশেষত ভারত থেকে পারমাণবিক নানা জিনিস অন্য দেশে রপ্তানির মাধ্যমে ব্যবসা করার উপর যে ''কুৎসিৎ নিষেধাজ্ঞা'' জারি করা আছে এই চুক্তি তা দূর করবে। ভারতের অ্যাটমিক অ্যানার্জি কমিশনের চেয়ারম্যান অনিল কাকোদকারও এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, এই চুক্তির মধ্য দিয়ে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যেরও সুবিধা হবে। যেমন প্রেসারাইজড হেভি ওয়াটার রিঅ্যাকটারস্ বা ভারী জল দিয়ে জ্বালানি ব্যবহার করার যে বিশেষ ধরনের চুল্লি, সেগুলো ভারতেই তৈরি হয় এবং কাকোদকারের মতে, আয়তনে এত ছোট চুল্লি অন্য দেশ বানাতে পারেনি। ফলে, ব্যবসার বাজারে এধরনের চুল্লির কদর বেশি হবে, উন্নয়নশীল দেশগুলো তা কিনতে আগ্রহীও হবে (ফ্রন্টলাইন ২৪ আগস্ট)। অতএব দেখা যাচ্ছে, এই চুক্তির ক্ষেত্রে ভারতের পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির চেয়ে পরমাণু শক্তি উৎপাদন সংক্রান্ত দ্রব্যের ব্যবসার স্বার্থটা বড়। তাছাড়া, পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ। এই বিপুল পুঁজি বিনিয়োগ করবে কে? যদি বিনিয়োগ সম্ভবও হয়, তবে উৎপাদন ব্যয় ও মুনাফা যোগ করে উৎপাদিত বিদ্যুতের ইউনিট প্রতি দাম, একটি হিসাবে ৫ টাকারও বেশি দাঁড়াবে, যা ক্রয় করা এদেশের সাধারণ মানুষের পক্ষে অসাধ্য বলা যায়। তাহলে যাঁরা এই চুক্তির মধ্য দিয়ে 'জাতীয় স্বার্থ' রক্ষার জয়গান করছেন, তাদের কাছে প্রশ্ন — এই জাতিটা কারা? দেশের ৯০ শতাংশ জনগণ, নাকি ১০ শতাংশ ধনিক শ্রেণী?

হাইড অ্যাক্ট

আগেই বলা হয়েছে, আমেরিকা যাতে তার দেশিয় আইনের বাধাকে অতিক্রম করে ভারতকে পরমাণু জ্বালানি ও প্রযুক্তি রপ্তানি করতে পারে, সে জন্যই বিশেষ আইন হিসাবে হাইড অ্যাক্ট আনা হয়েছে। এই আইনে কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে ভারতের উপর। কারণ, মার্কিন নেতৃত্বেই পরমাণু অস্ত্র সীমিতকরণের যে আন্তর্জাতিক চুক্তি রয়েছে, ভারত তাতে স্বাক্ষর না করা সত্ত্বেও ভারতের সাথে আমেরিকা পরমাণু দ্রব্যের ব্যবসা শুরু করলে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবেই, দেশের মধ্যেও উঠবে। অতএব, এমন একটা আইন করা হল, যার শর্তগুলি দেখিয়ে জর্জ বুশরা বলতে পারেন যে, ভারত এখন আমেরিকার পরম মিত্রশক্তি এবং পরমাণু অস্ত্র প্রসার আটকাতে ভারত সচেষ্ট।

এ জন্যই হাইড অ্যাক্টে বলা হয়েছে, আমেরিকার পরমাণু জ্বালানি পেতে

হলে ভারতের বিদেশনীতি আমেরিকার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া চাই। এরই অনুসরণে বলা হয়েছে, পরমাণু অস্ত্র সীমিতকরণের জন্য মার্কিন সরকার যেসব উদ্যোগ নেবে তাতে ভারতকে শামিল হতে হবে। এই উদ্যোগের মধ্যে পড়ে — ক) কোনও জাহাজে পারমাণবিক রসদ বহন করা হচ্ছে সন্দেহ হলে, ভারতের নৌবাহিনীর দায়িত্ব হবে সমুদ্রে সেই জাহাজকে আটকানো, খ) ইরান যাতে পরমাণু বোমা না বানাতে পারে, সে জন্য ভারতকে উদ্যোগী হতে হবে, গ) ভবিষ্যতে ভারত যদি বর্জ্য জ্বালানিকে প্লুটেনিয়ামে পরিণত করার, প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের মধ্যে যে অংশটি বিদ্যুৎ উৎপাদন করে, তার পরিমাণ বৃদ্ধি করার ও ভারি জল উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তি আমদানি করতে চায়, তবে সে জন্য মার্কিন আইনে সংশোধন করতে হবে। অর্থাৎ বর্তমান চুক্তি ভারতকে এই প্রযুক্তি আমদানি করার অধিকার বা সুযোগ দিচ্ছে না। তাহলে, ভারতের লাভ কী হল, এই প্রশ্নের জবাবে শ্রী কাকোদকার বলেছেন, আমেরিকা আজ পর্যন্ত কোনও দেশকেই এই প্রযুক্তি দেয়নি। তা বলে ভারতকেও ভবিষ্যতে দেবেনা এমন কথাও বলেনি। বরং আইন সংশোধনের কথা বলে তার সুযোগ রেখেছে। আবার, এই হাইড অ্যাক্টের মধ্য দিয়েই মার্কিন প্রশাসন বিধান রেখেছে, যাতে এই চুক্তির বাৎসরিক পর্যালোচনা করার অধিকার মার্কিন কংগ্রেসের হাতে না গিয়ে শুধু প্রেসিডেন্ট বা প্রশাসনের হাতেই থাকে। ভারতে যেমন কেন্দ্রের সরকারে বিজেপি না কংগ্রেস বসল, তার দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশ নীতি বদলায় না; শুধু বুলির সামান্য অদলবদল হয় মাত্র, আমেরিকার ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটবে। এ জন্যই এই পরমাণু চুক্তি যেমন ভারতের শাসক শ্রেণীই চেয়েছে, আমেরিকার দিক থেকেও মার্কিন কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থ এর পিছনে রয়েছে। এছাড়াও হাইড অ্যাক্টের আরও নানা খুঁটিনাটি জটিল দিক আছে, যার আলোচনায় এখন না প্রবেশ করেও এই পরমাণু চুক্তির রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক তাৎপর্য বোঝা সম্ভব।

প্রশ্ন উঠেছে, ইরান প্রসঙ্গে ভারতের নীতি কি তাহলে হাইড অ্যাক্টের দ্বারা নির্ধারিত হবে, যার পর ভারতের বিদেশ নীতিকে আর স্বাধীন বলা যাবে না? ইরান প্রশ্নে ভারত যে ক্রমেই আমেরিকার অবস্থনের সাথে গলা মেলাচ্ছে, এ সত্য হাইড অ্যাক্ট তৈরির বহু আগেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। হাইড অ্যাক্ট হওয়ার আগেই ইরানের পরমাণু শক্তির ব্যবহার প্রসঙ্গে ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আই এ ই এ-তে ইরানের বিরুদ্ধে ভারত ভোট দেয়, দ্বিতীয় দফায় ভারত ভোটদানে বিরত থাকে। এর দ্বারা ভারত আমেরিকার এই

অভিযোগকে সমর্থন জানায় যে, ''ইরানের পরমাণু কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ উদ্দেশে নয়।'' আবার, ইরান থেকে তরলীকৃত গ্যাস আনার জন্য যে পাইপলাইন পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে ভারতে আনার চুক্তি নিয়ে ভারত বহুদূর এগিয়েছিল, সে বিষয়ে ২৭ সেপ্টেম্বর '০৭ প্রস্তাবিত এক বৈঠকে ভারত প্রতিনিধি পাঠায়নি। কিন্তু পরপরই ভারতের অর্থমন্ত্রী বিবৃতি দিয়ে বলেন, ভারত ইরানের সাথে পাইপলাইন চুক্তি থেকে সরবে না, এ ব্যাপারে ভারত আগ্রহী। অর্থনৈতিক স্বার্থই প্রধান, কিন্তু রাজনৈতিক আশু স্বার্থে অনেক সময় নানা কূটনৈতিক বাক্যজালের মোড়ক দিয়ে 'যুদ্ধ-শান্তির' বুলি আওড়ানো হয়। ভারত-ইরান সম্পর্কের ক্ষেত্রে এখন সেটাই চলছে। এই ঘটনা দিয়ে যদি ভারতের স্বাধীনতা থাকা বা না-থাকার বিচার হয়, তবে পাকিস্তানের ভূমিকাকে কী বলা যাবে? আমাদের দেশে অনেক বামপন্থী শক্তিই পাকিস্তানকে আমেরিকার তাঁবেদার রাষ্ট্র মনে করে। অথচ, আই এ ই এ-তে ভারত যখন ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকার পক্ষে ভোট দিয়েছে, পাকিস্তান তখন ভোটদানে বিরত থেকেছে। আবার গ্যাস পাইপলাইন চুক্তি নিয়ে ইরানের সাথে যে বৈঠকে ভারত যায়নি, সেখানে পাকিস্তান গিয়েছে এবং ইরান-পাকিস্তানের মধ্যে চুক্তিও হয়েছে।

এই ঘটনা থেকে কি এই সিদ্ধান্ত করা হবে যে, ইরান প্রশ্নে ভোটদানে বিরত থাকার বা পাইপলাইন চুক্তির আগের দিন পর্যন্ত পাকিস্তান আমেরিকার তাঁবেদার ছিল, তারপরই স্বাধীন হয়ে গেল? তাছাড়া এটাও তো ঘটনা যে, ভারত এন পি টি-তে স্বাক্ষর না করেই আমেরিকার কাছ থেকে পরমাণু জ্বালানি পাবে। ফলে যাঁরা ভারতের এই শর্তাধীন পরমাণু চুক্তিতে স্বাক্ষর করার পরিণতিতে ভারত আমেরিকার তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে গেল বলে ব্যাখ্যা করছেন, তাঁরা আজকের এই সাম্রাজ্যবাদী যুগে একটি বুর্জোয়া রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের রাজনৈতিক প্রশ্নটি বিচার করতে অপারগ। শুধু তাই নয়, এ যুগে বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের অর্থ ও তাৎপর্য যে পুরনো ধারণার মধ্যে আর আবদ্ধ নেই, এটা ধরতেও তাঁরা ব্যর্থ হচ্ছেন।

ভারত-মার্কিন রাজনৈতিক-সামরিক জোট বাঁধার পথেই এই চুক্তি

আমরা সূচনাতেই বলেছি, এই পরমাণু চুক্তি আসলে ভারত-মার্কিন রাজনৈতিক-সামরিক এক বৃহত্তম সমঝোতারই অঙ্গ। এর মধ্য দিয়ে মার্কিন

সাম্রাজ্যবাদ তার স্বার্থকে চরিতার্থ করতে চাইছে, ভারতও তেমনি নিজস্ব স্বার্থ পূরণ করার জন্যই মার্কিন যুদ্ধ শিবিরের শরিক হচ্ছে। এই জোটবন্ধন আদৌ আকস্মিক নয়। এর একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া ও ইতিহাস আছে। অনেকে বলছেন, ১৯৯২ সালে কংগ্রেসের পি ভি নরসিমহা রাওয়ের সময়েই প্রথম ভারত-মার্কিন সহযোগিতা শুরু হয়েছিল। এ ধারণাও ঠিক নয়। সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অবস্থানের সময় জোট নিরপেক্ষ মঞ্চের যখন কার্যকারিতা ছিল, তখনও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভারতের সম্পর্ক ছিল কখনও নরম, কখনও গরম, যার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার কোনও আদর্শের স্থান লেশমাত্র ছিলনা। যাই হোক, নরসিমহা রাওয়ের সময় গঠিত হয় ভারত-মার্কিন 'আর্মি এক্সিকিউটিভ ট্রেনিং কমিটি'। এরপর দু'দেশের নৌবাহিনীর যৌথ মহড়ার জন্য একটি যৌথ স্টিয়ারিং কমিটিও গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে স্বাক্ষরিত হয় ভারত-মার্কিন প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি। এরপর ১৯৯৮ সালে ক্ষমতায় এসেছিল বিজেপি'র এন ডি এ সরকার। তখন বিদেশনীতির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল আমেরিকা এবং তার মিত্র দেশ, বিশেষত ইজরায়েলের সঙ্গে সামরিক বিষয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার ওপর। আজ ইজরায়েল হল ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রতিরক্ষা পার্টনার। ১৯৯৮ সালে বিজেপি সরকার দ্বিতীয় পরমাণু বোমা পরীক্ষার পর আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপাত কিছু বিরোধ সৃষ্টি হয়, যা ২০০১ সালেই প্রায় কেটে যায়। ২০০২ সাল থেকে শুরু হয় ভারত ও আমেরিকার মধ্যে একের পর এক নানা সামরিক চুক্তির যাত্রা। ২০০২ সালে আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা নীতিতে ভারতের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়ে বলা হয়, 'আমেরিকার জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার'। ২০০৪ সালের জুন মাসে ভারত এবং মার্কিন সরকারের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পর স্বাক্ষরিত হয়, 'নেক্সট স্টেপ ফর স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ' চুক্তি, যার মধ্য দিয়ে উভয় দেশের সামরিক সম্পর্ককে আঁতাতের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আমেরিকার এই স্ট্র্যাটেজি বা যুদ্ধনীতির মধ্যে যে উদ্দেশ্যটা নিহিত ছিল, সেটা একটা দলিলে ব্যাখ্যা করা হয়, যার নাম দেওয়া হয়, 'ইন্ডিয়া অ্যাজ এ গ্লোবাল পাওয়ার'। ২০০৫ সালের জুলাই মাসে গৃহীত এই দলিলে বলা হয়, আমেরিকা ভারতকে একটি 'মহাশক্তিধর' দেশে পরিণত করবে। ইতিমধ্যে ২০০৪ সালের মে মাসে নির্বাচনের পর কেন্দ্রে বিজেপি'র এন ডি এ-র জায়গায় কংগ্রেসের ইউ পি এ জোট সিপিএমের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় এসে

গেছে। সিপিএমের বহুবন্দিত ইউ পি এ-র ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচিতে এই সরকার স্বাধীন বিদেশনীতি নিয়ে চলবে — এ কথাও লেখা হয়েছে। এর একবছর যেতে না যেতেই, ২০০৫ সালের মার্চ ও জুলাই মাসে যখন আমেরিকা ভারতের সঙ্গে তার অর্থনৈতিক ও সামরিক মৈত্রী ঘনিষ্ঠ করার কথা ঘোষণা করল, তখন মনমোহন সিংহ সরকার কিন্তু তাকে অভিনন্দনই জানিয়েছিল। ২০০৫ সালের জুন মাসে ভারত-মার্কিন দুই সরকারের মধ্যে আবার স্বাক্ষরিত হয়, 'ভারত-মার্কিন প্রতিরক্ষা সম্পর্কের নয়া কাঠামো'। সেখানে পরিষ্কার করে দেওয়া হয় ভারত-মার্কিন এই সহযোগিতার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী। আমেরিকা যে তার সামরিক কার্যকলাপ চালাবার জন্য ভারতকে একটি ঘাঁটি হিসাবে তৈরি করতে চাইছে এবং যৌথ নৌ-মহড়া থেকে শুরু করে মিজোরামের পাহাড়ে সেনা মহড়ার দিকে যাচ্ছে, ভারত মহাসাগরে উভয় দেশের মধ্যে সহযোগিতাকে আরও গভীর করার কথা বলছে— এসবই ঐ নয়া কাঠামোর মধ্যে বলা ছিল।

ভারতের সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্খা

এরপর ২০০৫ সালের ১৮ জুলাই, জর্জ বুশ ও মনমোহন সিংহের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় গ্লোবাল পার্টনারশিপ বা বিশ্বজুড়ে পারস্পরিক সহযোগিতার সেই কুখ্যাত চুক্তি, যেখানে বলা হয়, ভারত ও আমেরিকা যৌথভাবে বিশ্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেবে। এজন্য রাষ্ট্রসংঘের আওতায় একটি তহবিল গড়ারও সিদ্ধান্ত হয় এবং তাতে ভারত প্রতি বছর এক কোটি ডলার দেবে বলে অঙ্গীকার করে। দেশে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মার্কিন পরিকল্পনার পরিচয় কি অজানা? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সদ্য ইরাক, আফগানিস্তান, যুগোশ্লাভিয়া, হাইতি ইত্যাদি নানা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে আমেরিকা কী তাণ্ডব চালাচ্ছে, তা জানার জন্য বিশেষজ্ঞ বা পণ্ডিত হওয়ার দরকার নেই। এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করার মধ্য দিয়েই ভারত বুঝিয়ে দিয়েছিল, ভারত কী ধরনের মহাশক্তিধর রাষ্ট্র হতে চায় এবং আমেরিকা তাকে এ ব্যাপারে কী সাহায্য করতে চায়। এরকম আরও অসংখ্য সামরিক আঁতাতের চুক্তি এই পর্যায়ে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে হয়েছে, যার উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র।

এই মহাশক্তিধর দেশ বলতে ভারতের আকাঙ্ক্ষাটি কীরকম, সে সম্পর্কে ২০০১ সালে আমেরিকা সফরে গিয়ে তদানীন্তন ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী যশোবন্ত সিনহার একটি বিবৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য —''**ভারতের ক্ষমতার ক্ষেত্র কতটা বিস্তৃত, দীর্ঘকাল ধরে সেটা দেখা হয়নি। কতজন মানুষ জানে যে, ভারতের একদম দক্ষিণ প্রান্তের ভূখণ্ড থেকে ইন্দোনেশিয়ার দূরত্ব মাত্র ৬৫ মাইল, অথবা, পাক-অধিকৃত কাশ্মীর ও তাজিকিস্তান ভারত থেকে মাত্র ২৭ মাইল দূরে অবস্থিত? কতজন জানে যে, ১৯৪৭ সালে ভারতের সীমান্ত ইরান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল? অথবা কেউ কি জানে যে, ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত কুয়েতে টাকাই ছিল সেদেশের আইনস্বীকৃত মুদ্রা? সুতরাং, আমরা ইন্দোনেশিয়া বা মধ্য এশিয়া অথবা পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা যে বলি, তার কারণ, এখানে আমাদের স্বার্থ আছে। এই গোটা অঞ্চলকে আমরা আমাদের প্রভাবাধীন অঞ্চল** (আওয়ার স্ফিয়ার অব ইনফ্লুয়েন্স) **বলে মনে করি**'' (টাইমস অব ইণ্ডিয়া, ১৩-৪-০১)। যেকোন সচেতন মানুষই বুঝবেন, এগুলো জাতীয় গৌরবের অভিব্যক্তি নয়, এ হচ্ছে নিকৃষ্ট জাতিদম্ভ, যা সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদের সাথে যুক্ত হয়ে থাকে। এ কি নিছকই বিজেপি সরকারের বিদেশমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বা বিজেপি'র নিছক দলীয় অভিমত? ২০০৫ সালের ৪ এপ্রিল দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে বর্তমান কংগ্রেস সরকারের বিদেশ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী রাও ইন্দরজিৎ সিং বলেন, ''ভারত সাহায্যপ্রাপক দেশ থেকে পরিবর্তিত হয়ে সাহায্যদানকারী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের প্রায় ১৫৬টা রাষ্ট্রকে আমরা কারিগরী ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা দিয়ে আসছি প্রায় চার দশক ধরে। আফ্রিকার বিভিন্ন বন্ধু দেশকে আমরা টাকার অঙ্কে ও কারিগরী ট্রেনিং-এ যা সাহায্য করেছি, তার পরিমাণ কয়েক হাজার কোটি টাকার উপর হবে।'' আফ্রিকায় উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলোতে সহায়তা দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়া ডেভেলাপমেন্ট অথরিটি গত ৫ বছরে এক্সিম ব্যাঙ্কের মারফত প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা সহজ শর্তে ঋণ দিয়েছে। ভারত ইতিমধ্যে তাজিকিস্তানের আইনিতে (Ayni) বিমানঘাঁটি লিজ নিয়েছে। ভারত বলে, তার উদ্দেশ্য নাকি অসামরিক। কিন্তু অন্যান্য দেশ মনে করে মধ্য এশিয়ায় ভারতের সামরিক উপস্থিতি বাড়ানোর জন্যই এটা করা হয়েছে। আফগানিস্তানে ভারতীয় প্রভাব বাড়াবার জন্য বিধ্বস্ত সেই দেশে রাস্তা ও হাসপাতাল বানিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে ভারত। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি দেশের চোখে ভারত একটি প্রভুত্ববাদী রাষ্ট্র। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি বিভিন্ন দেশকে এইড বা অর্থ সাহায্য দেয় সেসব দেশে নিজেদের পুঁজির বাজার তৈরির জন্য। যেসব দেশকে ভারত সহজ শর্তে

(soft loan) ঋণ দেয়, সেখানে ঐসব দেশে ভারতীয় পুঁজির জন্য বাজার তৈরি করাই ভারতেরও উদ্দেশ্য। এব্যাপারে ভারত দক্ষিণ গোলার্ধের পুরনো মিত্র দেশগুলিকে পরিত্যাগ করে নতুন আঞ্চলিক জোট করছে — এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার নানা দেশে সরাসরি ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি করার জন্য। (সূত্র ঃ শেনয়, ই পি ডব্লু, ১ সেপ্টেম্বর '০৭) ভারতের একচেটে পুঁজিপতি রতন টাটা ইংল্যান্ডে অবস্থিত ডাচ ইস্পাত কোম্পানি 'কোরাস' কেনার পর বলেন, আমি বাজার মূল্য থেকে বেশি দিয়ে এই কোম্পানি কিনেছি আন্তর্জাতিক বাজারে স্ট্যাটাস বাড়াবার জন্য। এই মালটিন্যাশনাল স্ট্যাটাস আসলে বিভিন্ন দেশের বাজারে ঢুকবার পথ প্রশস্ত করারই একটি উপায়। এই প্রসঙ্গে এই তথ্যও জেনে রাখা দরকার যে, ২০০৩-০৪ এবং ২০০৪-০৫ — এই দু'বছরে ভারতের পুঁজি আমদানি-রপ্তানির কারেন্ট অ্যাকাউন্টের হিসাবে উদ্বৃত্ত হয়। অর্থাৎ ভারতে যত পুঁজি আমদানি হয়েছে, তার থেকে বেশি হয়েছে পুঁজি রপ্তানি।

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং যখন বলেন, এই চুক্তির মধ্য দিয়ে 'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নেবে', তখন এই ভারত বলতে তিনি আসলে ভারতীয় ধনকুবেরদেরই বোঝান। তারাই এই চুক্তির মধ্য দিয়ে বিশ্বের পণ্যবাণিজ্যের বাজারে, পুঁজি রপ্তানির বাজারে, অস্ত্রব্যবসার বাজারে ঢোকার মার্কিন ছাড়পত্র বা সহযোগিতা পাওয়ার, অন্ততপক্ষে বাধা না পাওয়ার নিশ্চয়তা পাবে এবং তার দ্বারা ভারতীয় ধনকুবেরদের কোম্পানিগুলিও মাল্টিন্যাশনাল হয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় তো বটেই, বিশ্বের বাজারেও দাপট দেখাতে সক্ষম হবে, ছোট ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলো ভারতকেও ভয়ের চোখে দেখবে। জগৎসভায় ভারতীয় পুঁজির এই 'শ্রেষ্ঠত্বেরই' বড়াই করছেন প্রধানমন্ত্রী। এটাই হচ্ছে তাদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা! কিন্তু এর দ্বারা ভারতের ৯০ শতাংশ জনসাধারণ, যারা দারিদ্র্য ও বেকারির চাপে জর্জরিত হচ্ছে, তাদের জীবনে কি সুরাহা হবে? এই প্রশ্নে জাতীয় স্বার্থের ধ্বজাধারীরা নিরুত্তর।

ভারতীয় লগ্নিপুঁজির এই স্ট্যাটাস বাড়াবার উদ্দেশ্যের সাথে মিলিয়েই ভারত-মার্কিন সামরিক সমঝোতাকে বিচার করতে হবে। এই প্রশ্নে ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের 'কনভারজেন্স' বা মিলন ঘটেছে। তাই বিজেপির শাসনে মার্কিন-ভারত দহরম-মহরম কংগ্রেস আমলে শিথিল তো হয়ইনি, বরং ভারত-মার্কিন সামরিক সমঝোতাকে কংগ্রেস সরকার আরও উচ্চস্তরে নিয়ে গেছে। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, এই বিদেশনীতির পেছনে

রয়েছে ভারতের আসল শাসকশ্রেণী, অর্থাৎ ভারতের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী বা ধনকুবের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তাই সরকার বা বুর্জোয়াশ্রেণীর পলিটিক্যাল ম্যানেজাররা বদল হলেও রাষ্ট্রের বিদেশনীতিটা পাল্টায় না। '৯০-এর দশক থেকে আজ পর্যন্ত মার্কিন এবং ভারতের মন্ত্রী ও আমলাদের অসংখ্য উক্তি উল্লেখ করে দেখানো যায়, কীভাবে এই দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক লেনদেনের প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে কিন্তু দৃঢ়ভাবে এগিয়েছে। তার সব উদ্ধৃত করতে গেলে অযথা নিবন্ধ ভারাক্রান্ত হবে।

সামরিক লক্ষ্যের সাথে অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িয়ে আছে

লক্ষণীয় যে, '৯০-এর দশকে যখন নরসিমহা রাও সরকার আমেরিকার সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি করার দিকে এগিয়ে যায়, সেই সময়ই ভারতের অর্থনীতিকে দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির জন্য খুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া জোরদার করা হয়েছিল এবং সেটা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংহের হাত ধরেই। এই ঘটনা পরম্পরা বুঝিয়ে দেয়, আমেরিকার সাথে ভারতের সামরিক ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির পিছনে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির বিশ্ববাজার দখলের আকাঙ্ক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। আবার, আমেরিকার শিল্পপতিদেরও ভারতের বিমা থেকে শুরু করে খুচরো ব্যবসা পর্যন্ত অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে ঢুকবার স্বার্থ আছে। ভারতকে পরমাণু চুল্লি বিক্রি করবার জন্য মার্কিন সংস্থাগুলো এখন উদগ্রীব। মার্কিন, ফরাসি ও রাশিয়ার নানা কোম্পানির লোভাতুর দৃষ্টি এখন ভারতের দিকে। এদিকে ভারতীয় শিল্পপতিরাও পরমাণু চুল্লি নির্মাণে বিদেশিদের সাথে জোটবদ্ধ হতে চাইছে, যাতে মুনাফা লোটা যায়।

১৯৯১ সালে ভারত সরকার যখন উদার আর্থিক নীতি পাকাপাকিভাবে রূপায়ণ শুরু করে, তখনও সিপিএম-সিপিআই-এর মতো নকল মার্কসবাদীরা বলেছিল, আই এম এফ ও বিশ্বব্যাঙ্কের চাপের কাছে মাথা নুইয়ে ভারত তার স্বাধীন আর্থিক নীতি বিসর্জন দিচ্ছে, সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে আমরা বলেছিলাম, আই এম এফ থেকে বিপুল ঋণ নেওয়ার ফলে তাদের শর্তের কিছু চাপ আছে ঠিকই, কিন্তু ভারতের মতো একটি শক্তিশালী পুঁজিবাদী রাষ্ট্র সেই শর্তগুলি স্বেচ্ছায় বরণ করে নিচ্ছে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থেই। ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি এখন ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজারটি পুরোপুরি হস্তগত করতে চায়, সেজন্য একচেটিয়া পুঁজির বিনিয়োগের

ওপর যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ তুলে দিতে চায় এবং ভারতীয় বাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্ববাজারে ব্যাপকভাবে ঢুকতে চায়। এখানে 'ব্যাপকভাবে' শব্দটা উল্লেখ করা হল একথা বোঝাতেই যে, ভারতীয় পুঁজির এই বিদেশযাত্রা, যা তার সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রেরই বৈশিষ্ট্য, সেটা ১৯৯১ সালের পরে ঘটল তা নয়। আগেই ভারতীয় পুঁজির বিদেশযাত্রা ঘটেছে, এবার তাকে আরও জোরদার করার প্রক্রিয়া শুরু হল মাত্র। ভারতীয় বাজার পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির জন্য খুলে না দিলে, অন্য দেশের বাজার যা পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি বা আমেরিকার প্রভাবাধীনে রয়েছে, সেখানে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিকে ঢুকতে ওরা বাধা দেবে। এই পারস্পরিক লেনদেনের স্বার্থের ওপর ভিত্তি করেই এসেছে নয়া উদার আর্থিক নীতি। আজ একথা জলের মতো পরিষ্কার যে, উদার আর্থিক নীতি থেকে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি দেদার ফয়দা লুটেছে, ভারতীয় মালটিন্যাশনালের জন্ম হয়েছে এবং তারা সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের এখন সোচ্চার সমর্থক ও মদতদার। আর সে কারণেই এ ব্যাপারে সিপিএমের ডিগবাজিও লক্ষ্য করার মতো। পশ্চিমবঙ্গে সরকারে থাকতে গেলে বা কেন্দ্রের ক্ষমতার অলিন্দে ঘোরাফেরার ভাগ বাড়াতে হলে একচেটিয়া পুঁজির সমর্থন ছাড়া যে উপায় নেই, এটা সিপিএম ভাল করেই জানে। তাই, ৯০-এর দশকে যে নয়া আর্থিক নীতি বা বিশ্বায়নের মধ্যে সিপিএম ভারতের 'স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিসর্জিত হওয়ার বিপদ' দেখিয়ে গরম-গরম বিবৃতি দিয়েছিল, মনমোহন সিংকে বিশ্বব্যাঙ্কের এজেন্ট বলে প্রমাণ করতে পাতার পর পাতা প্রবন্ধ ছেপেছিল, সেই সিপিএম-ই পরবর্তীকালে বলেছে, 'বিশ্বায়নের কোনও বিকল্প নেই', 'পুঁজির কোনও রঙ নেই'। অর্থাৎ বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিকে আমন্ত্রণ জানানোয় কোনও ভুল নেই, বরং সেটাই তথাকথিত উন্নয়নের পথ। সর্বোপরি সেই কংগ্রেস ও মনমোহন সিংহের পরিচালিত সরকারকে ক্ষমতায় বসাবার জন্য সমর্থন দিতেও সিপিএমের কোনও দ্বিধা হয়নি। এখন ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তির দ্বারা 'ভারতের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব চলে যাচ্ছে', 'ভারতকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জুনিয়র পার্টনারে অধঃপতিত করা হচ্ছে', ইত্যাদি যেসব বিবৃতি সিপিএম নেতা প্রকাশ কারাত দিয়ে যাচ্ছেন, তার মধ্যেও কোনও আন্তরিকতা নেই। কারণ, কংগ্রেসের ইউ পি এ সরকারে আসার পর থেকে মার্কিন-ভারত সামরিক সম্পর্কের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির গোটা প্রক্রিয়াটা সিপিএম নেতারা জানতেন। লোকসভার স্পিকার সিপিএমের নেতা, সিপিএমের সমর্থনের ওপরই এই সরকার টিকে আছে, প্রায়

প্রতিদিনই প্রাতরাশ থেকে নৈশভোজ — কোনও না কোনও জায়গায় কংগ্রেস এবং সিপিএম নেতারা মিলিত হন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলাও হচ্ছে যে, এই চুক্তির যাবতীয় বিষয় তারা সিপিএমকে জানিয়ে রেখেছিল। ফলে একটা শিশুকেও বিশ্বাস করানো যাবে না যে, সিপিএম নেতারা এগুলো কিছু জানতেন না, আজ হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখলেন, ভারতের দুয়ারে ঘোরতর বিপদ এসে খাড়া হয়েছে। সিপিএম নেতা প্রকাশ কারাত এবং তাদের পলিটব্যুরোর কিছু বিবৃতি একত্র করে সিপিএম প্রকাশ করেছে, যার মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে, কংগ্রেস সরকারের আমলে ভারত-মার্কিন সামরিক ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির নানা দৃষ্টান্তে সিপিএম কীভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে। যদি বলা হয়, এগুলি কাগুজে বিবৃতি মাত্র, তাহলে কি ভুল হবে? কারণ, তাদের সমর্থনের ওপর যে সরকার নির্ভরশীল, তাকে এই পথ থেকে বিরত করার জন্য সিপিএমের হাতে একমাত্র বিবৃতি ছাড়া অন্য কিছু হাতিয়ার ছিল না, একথা কি কেউ বিশ্বাস করবে? তাছাড়া, এই প্রশ্নে তাঁরা কি দেশের মধ্যে গণআন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দিয়েছিলেন, ন্যূনতম কোনও উদ্যোগ নিয়েছিলেন? আজ যে সমর্থন তুলে নেওয়ার ফাঁকা হুমকি দিচ্ছেন, তাও কি সেসময় একটিবারও উচ্চারণ করেছিলেন? মাত্র কিছুকাল আগে কলাইকুণ্ডায় ভারত-মার্কিন যৌথ বিমান মহড়ার সময়, পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম সরকারের বিরোধিতাটা যে নিতান্তই হাস্যকর একটি নাটক ছিল, তাও সকলেই জানেন। ফলে আজ তারা প্রবল বিরুদ্ধতার, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জান-মান পণ করার যেসব ভান দেখাচ্ছেন, তারও উদ্দেশ্য অন্য। প্রথমত, দলের কর্মীদের কাছে ভাব দেখানো যে, নেতারা কংগ্রেস সরকারের লেজুড়বৃত্তি করছে না; দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদী বিপদ, কেন্দ্রে সংকট ইত্যাদি বলে দলের ভিতরকার কোন্দলকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা; তৃতীয়ত, নিজেদের ক্ষয়িষ্ণু বামপন্থী ভাবমূর্তিকে কিছুটা রিপেয়ার করার চেষ্টা করা।

সিপিএম যদি যথার্থই একটি মার্কসবাদী দল হতো, তাহলে এই পরমাণু চুক্তি প্রসঙ্গে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হওয়ার আওয়াজ তুলে ভারত রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রকে আড়াল করার কাজে নামত না। 'স্বাধীন বিদেশনীতি চাই' — এই মামুলি সস্তা স্লোগান তুলে বাজিমাৎ করার রাস্তায় যেত না। যেকোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিদেশ নীতি পরিচালিত হয় তার আভ্যন্তরীণ নীতির গতিপথ ধরেই। ভারত একটি শোষণমূলক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, এবং বহুকাল আগেই ভারত সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রও অর্জন করেছে, এবং ভারতের বিদেশনীতিও বরাবর —

সেই নির্জোট মঞ্চের সময় থেকে আজ পর্যন্ত — ভারতীয় পুঁজির স্বার্থেই রচিত হয়েছে। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বহুকাল আগেই দেখিয়েছেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কখনও ভারতের গলাগলি, আবার কখনও বিরোধিতা — এ হল ভারতের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের একই বিদেশনীতির দু-পিঠ মাত্র। এদেশের সিপিআই-সিপিএমের মতো 'মার্কসবাদী'রা ঐ বিরোধিতাকে দেখিয়ে বলেছে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারত প্রগতিশীল ভূমিকা নিচ্ছে; আবার যখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারত গলাগলির পথে গেছে, তখন বলেছে, ভারতের স্বাধীনতা চলে যাচ্ছে। এই মূল্যায়নকে শুধু ভুল বলে চিহ্নিত করা হলে এর আসল তাৎপর্য ধরা যাবে না। আসলে ভারত যে একটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র এই সত্যটাকেই হয় সিপিএম নেতৃত্ব বোঝেনা, নাহয় আড়াল করতে চায়। এ সত্য স্বীকার করলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতাকে কেবলমাত্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বা বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের প্রতি বিরোধিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা চলে না, ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদেরও বিরোধিতা করতে হয়, যদিও সিপিএমের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতাটাও এখন লোক-দেখানো। তত্ত্ব ও আদর্শগত ক্ষেত্রে এমন দেউলিয়া অবস্থার জন্যই 'ভারত পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ ঘটাতে পারবে কি না', এই প্রশ্ন তুলে সিপিএমের অবস্থা চূড়ান্ত হাস্যকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারত সরকার যখন পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটায়, সিপিএম তার বিরুদ্ধতা করে, আবার বর্তমান চুক্তির মধ্য দিয়ে 'ভারতের পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটাবার সার্বভৌম অধিকার কেড়ে নেওয়া হল' বলেও বিবৃতি দেয়। একই ব্যক্তি প্রকাশ কারাত একবার বলেন, এই চুক্তির দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব চলে যাচ্ছে, আর একবার বলেন, ভারত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জুনিয়র পার্টনার হচ্ছে। এই দুই বক্তব্য পরস্পরবিরোধী। ভারতের স্বাধীনতা যদি আমেরিকার কাছে 'বিকিয়েই যায়', তবে সেই ভারত আবার কি করে আমেরিকার 'পার্টনার' হয়?

আমরা পরমাণু চুক্তির প্রসঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নটি নিয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। কারণ, এই পরমাণু চুক্তির মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলে যে যুদ্ধ উত্তেজনা ও অস্ত্র প্রতিযোগিতার জন্ম দেওয়া হবে, আমেরিকার যুদ্ধ পরিকল্পনার সঙ্গে ভারত সক্রিয়ভাবে যুক্ত হবে, তার আঁচ এসে পড়বে ভারতীয় জনগণের ওপরই। ফলে এই পরমাণু চুক্তির বিরুদ্ধে জনগণকে অবশ্যই দাঁড়াতে হবে, কিন্তু কখনই কার্যকরীভাবে তারা দাঁড়াতে পারবে না, লড়াইও গড়ে তুলতে পারবে না, যদি এ লড়াইয়ে মূল শত্রু কে, সেটা তারা সঠিক

ভাবে চিহ্নিত করতে না পারে। ভারতবর্ষে আজ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন শুধু যদি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে সে আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য। ভারতীয় জনগণকে আজ অবশ্যই ভারত রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা ও ভূমিকার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়াতে হবে। আমেরিকা বা ইউরোপের জনগণ তাদের নিজ নিজ দেশে যুদ্ধবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যে আন্দোলন গড়ে তুলছে, তার লক্ষ্য কিন্তু সেই সেই দেশের সাম্রাজ্যবাদী সরকার ও রাষ্ট্রগুলো। ভারতবর্ষের জনগণকেও সেই পথে এগোতে হবে।

পরমাণু বিদ্যুৎ নিরাপদ নয় কেন?

ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তির তোড়জোড় শুরু হওয়ার পর নতুন করে পরমাণু বিদ্যুতের পক্ষে যুক্তি দেওয়া শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের হরিপুরেও পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন করার জন্য সিপিএম সরকার তৎপর হয়ে উঠেছে। যাঁরা পরমাণু বিদ্যুতের পক্ষে বলছেন, তাঁদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা প্রকৃতই মনে করেন, যেহেতু কয়লা বা তৈলসম্পদ সীমিত এবং ক্রমশ তা ফুরিয়ে আসছে, তাই শক্তির বিকল্প উৎস খোঁজাটা অত্যন্ত জরুরি। এই মানসিকতা থেকে তাঁরা তাপবিদ্যুতের বিকল্প হিসাবে পরমাণু বিদ্যুতের পক্ষে বলছেন। তাঁরা বলছেন, পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে, কারণ বিপুল পরিমাণে কয়লা বা খনিজ তেল পোড়ানোর ফলে বিশ্বে গ্রীনহাউস গ্যাসের মাত্রা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গিয়েছে। অতএব কয়লা বা খনিজ তেল পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদ্ধতি বন্ধ করা দরকার। সে কারণেই শক্তির বিকল্প উৎস হিসাবে পরমাণু বিদ্যুৎ চাই। তাঁরা মনে করছেন, যাঁরা পরমাণু বিদ্যুতের বিরোধী, তাঁরা আসলে বাস্তবজ্ঞানহীন এবং পিছিয়ে-পড়া চিন্তা নিয়ে চলছেন। পরমাণু বিদ্যুৎই আগামী দিনের ভরসা, তাই আমাদেরও পিছিয়ে থাকলে চলবে না।

বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি বর্তমানে যে একটা গুরুতর সমস্যা হিসাবে দেখা

দিচ্ছে এবং তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা বার বার হুঁসিয়ারি দিচ্ছেন, এটা ঠিক। কিন্তু কেন তাপমাত্রা বাড়ছে? এর একটা অন্যতম কারণ, অপরিমিত ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করার জন্য প্রচুর জ্বালানি পোড়ানো হচ্ছে। অর্থাৎ, যাদের টাকা আছে, তাদের ভোগের ব্যবস্থা করতে গিয়ে পরিবেশ বিপন্ন করা হচ্ছে। ভোগের পরিমাণের সঙ্গে মুনাফার প্রশ্নটিও সরাসরি জড়িত। পুঁজিবাদী মুনাফার জন্য বেপরোয়া ভোগবাদের প্রচার ও আয়োজন যে পরিবেশদূষণ ও তাপমাত্রাবৃদ্ধির জন্য দায়ী তা নিয়েও মতভেদ প্রায় নেই। কাজেই পরিবেশ দূষণ ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি কমানোর জন্য অপরিমিত কয়লা বা তেল পোড়ানো বন্ধ করা দরকার। কিন্তু প্রশ্ন হল, বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? দুনিয়ায় যত তেল পোড়ানো হচ্ছে, তার প্রায় ৭০ শতাংশই পোড়ানো হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। কেবল সেদেশে প্রচুর ব্যক্তিগত মোটরগাড়ি চলছে তাই নয়, যুদ্ধবাজ মার্কিন সামরিক বাহিনীর জন্যও বিপুল পরিমাণ তেল প্রতিনিয়ত পোড়ানো হচ্ছে। পরমাণু বিদ্যুতের পক্ষে বলতে গিয়ে যাঁরা গ্রীনহাউস গ্যাসের দোহাই দিচ্ছেন, তাঁরা মার্কিন যুদ্ধযন্ত্রের জন্য তেল পোড়ানো বন্ধ করার কথা তেমনভাবে বলছেন না। পরিবেশ সংক্রান্ত প্রতিটি বিশ্ব শীর্ষবৈঠকে মার্কিন কর্তারা সোজাসুজি বলে দিচ্ছেন, গ্রীন হাউস গ্যাস কমাবার কোনও চুক্তি করতে বা প্রতিশ্রুতি দিতে তাঁরা নারাজ। গত ২৮ সেপ্টেম্বর মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ আবারও বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই পরিবেশ দূষণ কমাবে। এর বাস্তব অর্থ হল, যদি কিছু করতে হয় তাঁরা নিজেরাই সেটা করবেন, কোনও আন্তর্জাতিক চুক্তির বাধ্যবাধকতার মধ্যে তাঁরা আসবেন না। অর্থাৎ কার্যক্ষেত্রে তাঁরা কিছুই করবেন না। তাহলে পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব কে নেবে? শিল্পোন্নত যে দেশগুলি এজন্য প্রধানত দায়ী, সেগুলিতে জোরালো গণআন্দোলনের অভাবের সুযোগে গায়ের জোরে তারা দায়িত্ব অস্বীকার করছে এবং গরিব দেশগুলির ওপর দায় চাপাবার চেষ্টা করছে। ব্যাপারটা কি এমন যে, গ্রীনহাউস গ্যাস কমাবার জন্য অপ্রয়োজনে কয়লা বা তেল পোড়ানো পুরোপুরি বন্ধ করেও দেখা যাচ্ছে যে, তাতেও যথেষ্ট হচ্ছে না? তা তো করা হয়নি। অযথা তেল পোড়ানোর পরিমাণ কমিয়ে গ্রীনহাউস গ্যাসের মাত্রা যে অনেকখানি কমানো সম্ভব, 'শিল্পায়নের' নামে বন ধ্বংস না করে পরিকল্পিত বনসৃজনের মাধ্যমেও গ্রীনহাউস গ্যাসের ক্ষতিকর প্রভাব যে কমানো যায় — এ কথাটা যাঁরা বলছেন, তাঁদের কথায়ও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। সকলেই জানেন, বিশ্বে সবচেয়ে বেশি তেল বিক্রি করে মার্কিন তেল

কোম্পানিগুলি। অথচ একথাও জোরের সাথে বলা হচ্ছে না যে, গ্রীনহাউস গ্যাস কমানোর জন্য তেল উৎপাদন ও বিক্রি কমাতে হবে। কারণ, তাহলে মার্কিন কোম্পানিগুলোর মুনাফায় টান পড়বে।

পরমাণু বিদ্যুতের বিরুদ্ধে পশ্চিমী দুনিয়ায় জনমত তীব্র

সংবাদে প্রকাশ, 'পরমাণু বিদ্যুৎচুল্লির প্রয়োজন, কার্যকারিতা ও সম্ভাব্যতার প্রশ্নে পশ্চিমী দুনিয়ায় জনমত তীব্র হয়ে উঠেছে। সেখানকার বহু দেশেই চুল্লি তৈরির কাজ বন্ধ অথবা ধীরগতি করা হয়েছে। ১৯৮০ সালে সুইডেনের নাগরিকরা ২০১০ সালের মধ্যে সমস্ত পারমাণবিক চুল্লি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফ্রান্সে ৬০ শতাংশ বিদ্যুৎ আসে পরমাণু চুল্লি থেকে। সেখানেও এই শিল্প আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন। একদিকে প্রায় ৩০০০ কোটি ডলার ঋণের বোঝা, অপরদিকে উদ্বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতার সমস্যা। ১৯৭০-এর দশকে সে দেশে বছরে গড়ে ৬টি করে চুল্লির ফরমান দেওয়া হলেও ১৯৮৫ সালে মাত্র ১টি চুল্লির ফরমান দেওয়া হয়'(দৈনিক স্টেটসম্যান, ৫-১২-০৬)। 'জার্মানির মত অতি শিল্পোন্নত দেশে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা যেখানে ২০০১ সালে ছিল ২১ গিগাওয়াট, তা কমে ২০১৫ সালে দাঁড়াবে বলে স্থির করা হয়েছে ১৩ গিগাওয়াটে, এবং ২০২৫ সালে আর কোনওরকম পরমাণু বিদ্যুৎ সেদেশে হবে না। ব্রিটেনে পরমাণু বিদ্যুৎ যা ছিল ১২ গিগাওয়াট ২০০১ সালে, তা ক্রমান্বয়ে কমে ২০২৫ সালে হবে মাত্র ৪ গিগাওয়াট'(তথ্যসূত্র ঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, এনার্জি ইনফরমেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, অ্যানুয়াল এনার্জি আউটলুক ২০০৪, ওয়াশিংটন ডি সি। দৈনিক স্টেটসম্যান, ১৫-১-০৭)। এই যখন অবস্থা, তখন গ্রীনহাউস গ্যাসের অজুহাত তুলে এদেশে পরমাণু বিদ্যুতের পক্ষে ওকালতি করতে একদল তথাকথিত 'আধুনিক ও অগ্রসর' শিক্ষিত ব্যক্তির বিন্দুমাত্র বাধছে না।

বিদ্যুৎ ব্যবহারে মজুত ইউরেনিয়াম বছর পঞ্চাশেক চলতে পারে

যাঁরা ভাবছেন, কয়লা কিংবা খনিজ তেলের মজুত ভাণ্ডার ফুরিয়ে আসছে বলে পরমাণু বিদ্যুতের দিকে যাওয়া অপরিহার্য, তাঁদের ঠাণ্ডা মাথায় কয়েকটি কথা ভেবে দেখতে হবে। প্রথমত, কয়লা বা খনিজ তেল কতদিন চলবে তা নিয়ে

বহু বিশেষজ্ঞই সরকারের সঙ্গে একমত নন, অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন কয়লা ও তেল যা আছে তা দিয়ে আরও ৩৬০ বছর চলবে। কাজেই পরমাণু বিদ্যুতের দিকে যাওয়ার কোন প্রয়োজনই নেই। তা সত্ত্বেও যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যতদিনই চলুক একদিন কয়লা ও তেলের মজুত ফুরোবেই কাজেই পরমাণু শক্তি ব্যবহারের দিকে যেতেই হবে, তাহলেও কতগুলি প্রশ্ন থেকেই যায়। একথা ঠিক যে, বিজ্ঞানের নিয়মানুসারেই তেল বা কয়লার তুলনায় তেজস্ক্রিয় জ্বালানি পরিমাণে অনেক কম লাগে। অঙ্কের হিসাব কষে অনেকে দেখাচ্ছেন যে, ২৭০০ টন কয়লা পুড়িয়ে যে শক্তি উৎপাদন করা যায়, মাত্র ১ কেজি ইউরেনিয়াম থেকে সেই পরিমাণ শক্তি পাওয়া সম্ভব। কিন্তু একইসঙ্গে ভাবা দরকার, বিশ্বে ইউরেনিয়ামের মজুত ভাণ্ডার কতটা। ২০০৪ সালে নিউক্লিয়ার এনার্জি এজেন্সি এবং আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার দেওয়া হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে মোট ইউরেনিয়াম আছে ১.৪৪ কোটি টন, কিন্তু তার মধ্যে অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনকভাবে খননযোগ্য ইউরেনিয়ামের পরিমাণ হল মাত্র ৩৫ লক্ষ টন। বর্তমানে পৃথিবীতে বছরে ৬৭,০০০ টন ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ এখন বিশ্বে যতটা পরমাণু বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে, তা আর না বাড়ালেও মজুত ইউরেনিয়াম দিয়ে মাত্র বছর পঞ্চাশেক চলতে পারে। তাছাড়া পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পের আর একটা বড় সীমাবদ্ধতা হল, এই প্রকল্প যত বিদ্যুৎ তৈরি করে, তার একটা বড় অংশই প্রকল্প চালু রাখতে ব্যয় করতে হয়, ব্যবহারযোগ্য বিদ্যুৎ পাওয়া যায় কম। '২০০১ সালে প্রাপ্ত এক পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, সে সময় ভারতে নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশনের অধীনে ১০টি সক্রিয় ও ৪টি নির্মীয়মান পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ছিল। সক্রিয় ইউনিটগুলির উৎপাদনক্ষমতা প্রায় ২০০০ মেগাওয়াট। কিন্তু খুব বেশি হলেও প্রকৃত উৎপাদন হয় প্রায় ৪০ শতাংশ, অর্থাৎ মোট ৮০০ মেগাওয়াট, যা মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের দুই শতাংশও নয়। এতদ্‌সত্ত্বেও পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এখনও পর্যন্ত ৫০,০০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে' (মানবাধিকার কর্মী আনন্দ মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে ঃ দৈ. স্টে. ৫-১২-০৬)। এই দিক থেকে ভাবলেই দেখা যাবে, বিকল্প হিসাবে তেজস্ক্রিয় জ্বালানি মোটেই কার্যকর নয়।

তদুপরি প্রশ্ন উঠেছে, আমাদের মত ছোট-বড় নদীবহুল দেশে যেখানে জলবিদ্যুৎ তৈরির বিরাট সুবিধা আছে, সেখানে এই সুবিধাকে ঠিকমতো ব্যবহার

করা হচ্ছে না কেন? ব্যাপকহারে বায়ুবিদ্যুৎ তৈরি ও ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না কেন? সৌরবিদ্যুৎ গবেষণার কাজেও যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না কেন? কেন শুধু পরমাণু বিদ্যুতের পিছনে সরকার অকাতরে টাকা ঢালছে? তাহলে, সরকারের প্রধান লক্ষ্য কি বিদ্যুৎ, না কি পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পের রিঅ্যাক্টর থেকে পরমাণু বোমার উপাদান প্লুটোনিয়াম সংগ্রহ করা?

পরমাণুর তেজস্ক্রিয়তায় ক্যান্সার সহ বহু মারণরোগের আক্রমণ

ইউরেনিয়াম আকরিক থেকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহারযোগ্য ইউরেনিয়াম (ইউরেনিয়াম ২৩৫) পাওয়া যায় খুবই কম। এক টন আকরিকে ইউরেনিয়াম অক্সাইড থাকে মাত্র ৩ কিলোগ্রাম, তা থেকে জ্বালানিযোগ্য বিশেষ জাতের ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় মাত্র ২০ গ্রাম। বাকি প্রায় এক টনই হয়ে যায় বর্জ্য। ইউরেনিয়াম-আকরিক থেকে জ্বালানিযোগ্য ইউরেনিয়াম বের করা শুধু বিপুল খরচসাপেক্ষ ও বিপজ্জনকই নয়, এই প্রক্রিয়ায় যে বিপুল পরিমাণ বর্জ্য তৈরি হয়, সেটাও মারাত্মক রকমের তেজস্ক্রিয় ও বিপজ্জনক। পরমাণু বিদ্যুতের পক্ষে যাঁরা বলছেন, সেই সরকারি কর্তারা পরমাণু জ্বালানির বর্জ্য ও তার বিপদ সম্বন্ধে অদ্ভুতভাবে নীরব। কয়লা ও তেল পোড়ানোর ফলে সৃষ্ট দূষণের সঙ্গে পারমাণবিক বর্জ্যের দূষণের চরিত্রে বিরাট পার্থক্য। প্রথমোক্ত দূষণের প্রতিকার করা সহজ, কিন্তু পারমাণবিক দূষণের প্রতিকার প্রায় অসম্ভব। অতি সামান্য পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থের সংস্পর্শে এলে ক্যানসার সহ বহু ধরনের দুরারোগ্য রোগের আক্রমণ ঘটে । এমনকী মায়ের গর্ভস্থ শিশুও বিকলাঙ্গ হয়। তেজস্ক্রিয়তা এমনই জিনিস যে, চোখে দেখে বা সহজ কোনও রাস্তায় তা এড়ানো সম্ভব নয়। উপযুক্ত প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা না থাকলে জল, বায়ু, খাদ্য সব কিছুর মধ্য দিয়েই তেজস্ক্রিয় পদার্থ মানুষের শরীরে ঢুকতে থাকে। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, বহুরকম মারাত্মক বিষও মানুষ অতি অল্প মাত্রায় সহ্য করতে পারে, কিন্তু পারমাণবিক দূষণ অতি সামান্য মাত্রায় হলেও জীব তা সহ্য করতে পারে না। একটিমাত্র তেজস্ক্রিয় পরমাণুই মানুষের শরীরে ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে। সেই ভয়াবহতার কারণেই, সংবাদে প্রকাশ, উত্তরপ্রদেশের নারোয়া অথবা গুজরাটের কাকরাপাড় পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইঞ্জিনিয়ার ও অফিসাররা ২৬ কিলোমিটার এবং ঝাড়খণ্ডের যাদুগোড়ার কর্মী অফিসাররা খনি অঞ্চল থেকে

৪০ কিলোমিটার দূরত্বের বাজার থেকে শাক-সবজি কেনাকাটা করেন। সেইজন্যই, মার্কিন প্রশাসন নিরাপত্তার ন্যূনতম নীতিগুলি লঙঘন করে ভয়ঙ্কর এই পারমাণবিক বর্জ্য ফেলে দিত নেভাদার মরুভূমি অঞ্চলে এমনকী সমুদ্রের জলে, যাতে লোকচক্ষুর আড়ালে কাজটা সেরে সমালোচনা এড়ানো যায়। পারমাণবিক বর্জ্যের তেজস্ক্রিয়তা থেকে বিশ্বের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার বিপদও গ্রীনহাউস গ্যাসের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। পৃথিবীর বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় কোটি কোটি বছর আগে ভূগর্ভে জমে থাকা তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে বিকিরিত তাপে পাথর গলে যে ম্যাগমা তৈরি হয়েছিল, তা-ই আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে জ্বলন্ত লাভার আকারে বেরিয়ে এসেছিল, তা বিজ্ঞানীরা জানেন। কাজেই পৃথিবীকে উত্তপ্ত করতে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভূমিকা কী হতে পারে, তা তাঁদের অজানা নয়।

তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ফেলার জন্য কোন পাত্রই নিরাপদ নয়

এও মনে রাখা দরকার, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ফেলার জন্য কোন পাত্রই নিরাপদ নয়। কারণ তেজস্ক্রিয় পদার্থের সংস্পর্শে এলে অন্যান্য নিস্ক্রিয় পদার্থও তেজস্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ধাতু তো বটেই, এমনকী বিজ্ঞানের গবেষণাগারে ব্যবহৃত এবং নিরাপদ বলে পরিচিত বোরো-সিলিকেট কাঁচ পর্যন্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থের সংস্পর্শে এলে, তার সঙ্গে বিক্রিয়ায় তেজস্ক্রিয় ও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। বিশেষভাবে তৈরি সিন্থেটিক পদার্থও এক্ষেত্রে নিরাপদ নয়। আগে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য মোটা ধাতুর পাত্রে ভরে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হতো। উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হত, সমুদ্রের জলে পাত্রগুলোকে ঠাণ্ডা রাখা সহজ হবে। ঠাণ্ডা না রাখলে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে উদ্ভূত তাপে ধাতুর পাত্র গলে গিয়ে তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু অচিরেই বিশেষজ্ঞরা বলেন, এই ব্যবস্থার ফলে সমুদ্রের জলের তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে বিপর্যয় দেখা দেবে। তার ফলে বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থায় বিপজ্জনক তেজস্ক্রিয় বর্জ্যকে মোটা ধাতুর পাত্রে ভরে মাটিতে পুঁতে দেওয়ার কথা। কিন্তু তাতেও পাত্র তেতে উঠে গলে যাবার বিপদ থেকেই যায়, তাই বর্জ্য ভরা পাত্রটির বাইরে চারদিক থেকে পাইপ দিয়ে জড়িয়ে সর্বদা ঠাণ্ডা জল চালিয়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি আটকে রাখা উচিৎ। এই কাজ যে বিরাট ব্যয়সাপেক্ষ তা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া বর্জ্য-ভরা এই পাত্রগুলো উত্তপ্ত হলে তা কার্যত ছোট ছোট পারমাণবিক বোমার মতো হয়ে দাঁড়ায়। তাই দেখা গিয়েছে,

যেখানে বর্জ্য ফেলা হয়, সেখানে মাঝে মাঝে পারমাণবিক বিস্ফোরণও ঘটে থাকে। কাজেই অতীব সতর্কতার সঙ্গে বর্জ্য সংরক্ষণের ব্যয়বহুল ব্যবস্থা চালু রাখতে হয়, যা বাস্তবে করা হয় না। দু'চার দিন বা দু'চার বছর একাজ করলে চলে না। হাজার বছর ধরে সে কাজ করে যাওয়া বাধ্যতামূলক। বর্জ্যের মধ্যে যা যা থাকে, তার মধ্যে দুটি পদার্থ খুবই বিপজ্জনক— একটি হল রেডন গ্যাস, যা বাতাসে মিশে গিয়ে শ্বাসের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করে ক্যান্সার সৃষ্টি করে, অপরটি হল প্লুটোনিয়াম। প্লুটোনিয়ামের অর্ধজীবন যেহেতু ২৪,৩৬০ বছর, অর্থাৎ এই সময়ে এক কিলো বা এক টন প্লুটোনিয়ামের অর্ধেক, ৫০০ গ্রাম বা আধ টন প্রাকৃতিক নিয়মে তেজস্ক্রিয়তা হারায়, বাকি ৫০০ গ্রাম বা আধ টন তেজস্ক্রিয় থেকে যায়। পরবর্তী অর্ধজীবনে ৫০০গ্রাম তেজস্ক্রিয় প্লুটোনিয়ামের ২৫০ গ্রাম তেজস্ক্রিয় থাকে। তাই পুরো ব্যবস্থাটা চালু রাখতে হবে কম করে চারটি অর্ধজীবন বা এক লক্ষ বছর। পাঁচ বছর মেয়াদী একটা সরকার মানবসমাজের উপর এক লক্ষ বছরের একটা বিপুল দায় কোন অধিকারে চাপিয়ে দেবে, সেটাও একটা গুরুতর প্রশ্ন। সে সিদ্ধান্ত একতরফা সরকার না নিয়ে বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ এবং সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত কমিটি নেবে কি না, তা ঠিক করার একটা প্রশ্ন থাকে। সর্বোপরি সবটাই যেহেতু করা হচ্ছে বিজ্ঞানের বিকাশের জন্য নয়, পরমাণু বোমা বানানো এবং বিদ্যুৎ বেচে মুনাফা করার জন্য, তাই তার জন্য সমগ্র মানবসমাজকে অজানা এবং ভয়ংকর বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়াও কতটা উচিত, সেই নীতিগত প্রশ্নটাও এক্ষেত্রে জড়িত।

উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার হঠকারিতা

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে কি বিপজ্জনক বলে প্রযুক্তির অগ্রগতির সুযোগ মানুষ নেবে না? নিশ্চয় তা নয়। সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ তা করে এসেছে। কিন্তু, সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হওয়ার পর থেকে প্রযুক্তির প্রয়োগ হয়েছে সঙ্কীর্ণ শ্রেণীস্বার্থে, সামগ্রিক সমাজের স্বার্থে নয়। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই সামগ্রিক সমাজকল্যাণের স্বার্থে পরিকল্পিতভাবে হাতেকলমে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করে দেখিয়ে গিয়েছেন লেনিন ও তাঁর সুযোগ্য ছাত্র স্ট্যালিন। মনে রাখা দরকার, প্রযুক্তির অগ্রগতি কথাটার মানে শুধু উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষমতা অর্জন নয়, প্রযুক্তির ব্যবহারকে নিরাপদ করাটাও প্রযুক্তির অগ্রগতির একটা

মাপকাঠি। যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা মানবসমাজের পক্ষে নিরাপদ নয়, বা আজও নিরাপদ করার কৌশল মানবসমাজের আয়ত্ত হয়নি — সেই প্রযুক্তিকে কতটা আধুনিক ও অগ্রসর বলা যাবে, তাও ভেবে দেখা দরকার।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে পরমাণু প্রযুক্তির ব্যবহার আজও যথেষ্ট নিরাপদ নয়। তাই শিল্পোন্নত দেশ হয়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু বিদ্যুতের দিকে যাচ্ছে না, অথচ তারাই মার্কিন একচেটিয়া পুঁজির মুনাফার স্বার্থে অন্য দেশে পরমাণু চুল্লি চালান দিচ্ছে। এজন্যই পরমাণু বিদ্যুৎ নিয়ে প্রশ্নটা উঠছে। না হলে চিকিৎসা সহ হাজার একটা কাজে পরমাণু শক্তি এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার হচ্ছে, তা নিয়ে তো প্রশ্ন উঠছে না! বর্তমান অবস্থায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে পরমাণু প্রযুক্তি ব্যবহার করলে, সেটা হবে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের নামে হঠকারিতা। মুনাফার জন্য যে কোন হঠকারি পদক্ষেপ নেওয়া, এমনকী মানবসমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়াও পুঁজিবাদের পক্ষে সম্ভব, সেকারণেই মানবদরদী বিজ্ঞানীরা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধেই বলে গিয়েছেন।

আধুনিক নিরাপত্তা সহ আধুনিক বিজ্ঞানের পরিকল্পিত ব্যবহার বিশ্বে প্রথম করে দেখিয়েছে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র

বিংশ শতকের প্রথমার্ধে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছিলেন, কীভাবে সমাজের স্বার্থে বিজ্ঞানের সাহায্যে বিপজ্জনক কয়লাখনিগুলির কাজকে নিরাপদ করা যায়। খনিগর্ভে শ্রমিক নামিয়ে কয়লা কেটে তোলার বিপদকে এড়ানোর জন্য খনিতে আগুন দিয়ে পাইপের সাহায্যে কয়লার গ্যাস বের করে এনে তা দিয়ে বয়লার, বা টার্বাইন চালানোর যে আধুনিক ধারণা ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছিলেন, তা প্রয়োগ হয়েছিল শিল্পে অগ্রসর পুঁজিবাদী ইংল্যান্ডে নয় রাশিয়ায়, স্ট্যালিনের নেতৃত্বে। কারখানার উত্তপ্ত জলকে ঠাণ্ডা করার জন্য শক্তিক্ষয় না করে শহরের রাস্তার তলা দিয়ে পাইপ বসিয়ে তপ্ত জল চালিয়ে দেওয়া হত, যাতে রাস্তায় জমে থাকা বরফ গলে যেত, আবার বিনা ব্যয়ে বয়লারের জল ঠাণ্ডা হয়ে যেত। বিজ্ঞানকে তাঁরা এভাবেই মানুষের কল্যাণে লাগিয়েছিলেন, যা দেখে কানাডার বিজ্ঞানী ডাইসন কার্টার বিস্মিত ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। সোভিয়েট বিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য অগ্রগতি এবং মানবকল্যাণে তার প্রয়োগ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহাও। মুনাফার উদ্দেশ্য থেকে পরিচালিত পুঁজিবাদ বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলতে

পারে না। মুনাফার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির নামে শ্রমিককে সে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। সংশোধনবাদ এসে সোভিয়েটে যখন মানুষের সামনে তার কর্মোদ্যোগের সামাজিক লক্ষ্যকে গোলমাল করে দিল এবং ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দিতে শেখালো, তখনই এল কাজের ক্ষেত্রে শ্লথতা ও অবহেলা। সেই স্থবিরতার পর্যায়ে ১৯৮৬ সালে সেদেশে ঘটে চেরনোবিলের পারমাণবিক রিঅ্যাকটরে বিস্ফোরণের ঘটনা, পারমাণবিক চুল্লি সচল রাখার ক্ষেত্রে মানুষের স্বাভাবিক ভুলের ভয়াবহ পরিণতির নজির হিসাবে যাকে তুলে ধরা হয়। মনে রাখা দরকার, কেবল সংশোধনবাদী সোভিয়েটেই এই ঘটনা ঘটেনি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ঘটেছে লং আইল্যান্ডের চুল্লিতে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। তা ছাড়া আরও কত দুর্ঘটনা ঘটেছে তা কারোর জানা নেই, কারণ নিষেধাজ্ঞার বেড়াজালে সেই সংবাদ চেপে দেওয়া হয় শিল্পোন্নত দেশে। '১৯৮৬ সালের জুন মাসে কলকাতার সোভিয়েত দূতাবাস থেকে প্রকাশিত বুলেটিন থেকে জানা যায়, ১৯৭১--৮৬ সালের মধ্যে ১৪টি দেশে ১৫১টি বড় বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে। ১৯৭৬ সালে শুধু পশ্চিম জার্মানিতে ১৩৯টি দুর্ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। আমেরিকার একটি সংস্থার রিপোর্টের মতে, সেদেশের বাণিজ্যিক পরমাণু কেন্দ্রগুলিতে ১৯৮৬ সালে ২৮৩৬টি, এবং পরের বছর ২৮১০টি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। ... ভারতের পরমাণু বিশেষজ্ঞ বীরেন্দ্র শর্মা ১৯৮৯ সালে বলেছিলেন, ভারতের পরমাণু কেন্দ্রগুলিতে কমপক্ষে ৩০০টি ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। এর ফলে তিন হাজারেরও বেশি ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মীরা সেসময় তেজস্ক্রিয়তার শিকার হন'(দৈনিক স্টেটসম্যান, ৫-১২-০৬)।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, পরমাণু বিদ্যুৎ এত ব্যয়বহুল এবং বিপজ্জনক জানা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার পরমাণু বিদ্যুতের জন্য এত আগ্রহী কেন? কারণটা বোঝা মোটেই কঠিন নয়। বিজ্ঞানের বিকাশ, শক্তির বিকল্প উৎস সন্ধান, বা জনগণকে সস্তায় বিদ্যুৎ দেওয়া — কোনটাই আসলে সরকারের উদ্দেশ্য নয়। তাদের মূল উদ্দেশ্যটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। গণদাবী'র ৬০বর্ষ ১০ম সংখ্যায় 'ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি' প্রসঙ্গে আলোচনায় আমরা তা দেখিয়েছি। আমরা দেখিয়েছি, ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য 'পরমাণু শক্তিধর' রাষ্ট্র হিসাবে মার্কিন স্বীকৃতি ভারতের শাসকদের কাছে জরুরি। ১৯৭৪ সালে ভারত বহুলাংশে মার্কিন সাহায্য ছাড়াই পরমাণু বোমা পরীক্ষা করেছিল। কিন্তু আঞ্চলিক বৃহৎ শক্তি হিসাবে নিজস্ব আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করাই যথেষ্ট নয়, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের শরিক হওয়াটাও

দরকার। এই তাগিদ থেকেই ভারতের শাসকরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধজোটের শরিক হওয়ার দিকে এগোতেও দ্বিধা করছে না। সেই একই তাগিদ থেকেই তারা পরমাণু শক্তির চর্চা ও গবেষণা করছে। 'শান্তির জন্য পরমাণু গবেষণা' যে একটা মুখোস— তা এখন প্রায় সকলেরই জানা। অথচ, সিপিএমও আজ তথাকথিত 'শান্তির জন্য পরমাণু গবেষণা'র পক্ষে একই যুক্তি তুলে শাসকশ্রেণীর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতেই কার্যকরী ভূমিকা নিচ্ছে। পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনেও তারা কেন্দ্রের সহযোগী। ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্যবাদী চরিত্র থেকেই জন্ম নিচ্ছে পরমাণু অস্ত্রভাণ্ডার স্ফীত করার বাসনা, এবং সেই বাসনার পরিপূরক পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র এ রাজ্যে স্থাপন করার উদ্যোগ বারবার নিয়ে সিপিএমও বুঝিয়ে দিয়েছে — তারা আসলে কোন্ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী দল?